অগ্নি-বীণার নান্দনিকতা ও এর সমাজতত্ত্ব

মোহাম্মদ আজম

সাহিত্য পত্রিকা
Shahitto Potrika

eISSN 3006-886X
ISSN 0558-1583
Volume 58
Number 1-2
February 2023

সাহিত্য পত্রিকা: ফাল্গুন ১৪২৯ (২০২৩)
বর্ষ: ৫৮ সংখ্যা: ১-২ পৃষ্ঠা: ২৫-৪৬

DOI 10.62328/sp.v58i1-2.2

সাহিত্য পত্রিকা
বাংলা বিভাগ ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

*অগ্নি-বীণা*র নান্দনিকতা ও এর সমাজতত্ত্ব

মোহাম্মদ আজম*

সারসংক্ষেপ: কাব্য-বিচারের সমাজতাত্ত্বিক রীতি-পদ্ধতি যেমন জনপ্রিয়, ঠিক তেমনি কাব্যধারার নিজস্ব বলয়ের সীমার মধ্যে নান্দনিক পর্যালোচনাও যথেষ্ট প্রভাবশালী। বর্তমান প্রবন্ধে এ দুয়ের সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে *অগ্নি-বীণা* কাব্যের নন্দনসূত্র উন্মোচিত হয়েছে। দেখানো হয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ ও তীব্র কাব্য হিসেবে *অগ্নি-বীণা* বাংলা কাব্যধারায় ছেদ যেমন ঘটিয়েছে, ঠিক তেমনি নানা মাত্রার ধারাবাহিকতাও রক্ষা করেছে। কিন্তু পরিপ্রেক্ষিতগত স্বাতন্ত্র্যের কারণে সমাজপটের উন্মোচন ব্যতিরেকে ওই ছেদ ও ধারাবাহিকতার যথার্থ মূল্যায়ন দুরূহ। এ কারণেই সমাজতাত্ত্বিক পটভূমিকে সমীকৃত করেই কেবল কাব্যটির নতুন নান্দনিকতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন সম্ভব। বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে নজরুল কাব্যের সমাজতত্ত্ব ব্যাপকভাবে আলোচিত হলেও মুখ্যত 'বিষয়' হিসেবেই তা বিবেচনায় এসেছে। অগ্নি-বীণার বর্তমানময়তা, ধ্বনিময় সাঙ্গীতিকতা ও উচ্চকণ্ঠ বক্তব্যময়তাকে প্রভাবশালী নন্দনতত্ত্বের নিরিখে বিচার করায় তার নান্দনিক তাৎপর্য শ্রেষ্ঠাংশে অধরাই থেকে গেছে। এ প্রেক্ষাপটে বর্তমান প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে, পটভূমিগত নতুনত্ব ও ভিন্নতার বিশ্লেষণ কাব্যটির নন্দনসূত্র তুলনামূলক কার্যকরভাবে উন্মোচন করতে পারে।

প্রকাশমাত্রই *অগ্নি-বীণা* (১৯২২) ব্যাপকভাবে পঠিত ও বন্দিত হলেও, এবং জন্মের শতবর্ষ পরে বাংলা সাহিত্যের ধারাপ্রবাহে নিজের প্রবল প্রতাপ অক্ষুণ্ন রাখলেও, এ লেখায় আমাদের প্রথম ও প্রধান দাবি এই যে, কাব্যটির পঠন-পাঠনে এর সমাজতাত্ত্বিক পটভূমি প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম প্রাধান্য পেয়েছে। সমাজতাত্ত্বিক পটভূমি যে কোনো শিল্পকলার ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেই অন্যতম প্রধান, বা এমনকি দিক-নির্দেশক, ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে। হুমায়ুন কবিরের (২০০২) মতো লিবারেল ঘরানার সমালোচক যেমন বলতে পারেন, সাহিত্য-পাঠে সমাজতত্ত্বই হওয়া উচিত প্রধান বিবেচ্য, ঠিক তেমনি ওয়াল্টার বেনজামিনের (২০২০) মতো নয়া-মার্কসবাদী ঘরানার সাহিত্যতাত্ত্বিক ঘোষণা করতে পারেন, 'শিল্পের জন্য শিল্প' মতবাদীরা শিল্পের সমাজতাত্ত্বিক কার্যকারণ নির্দেশ করতে অপারগ হওয়ায় এ ধারার চর্চা আদতে ধর্মতত্ত্বীয় চর্চার অনুরূপ। তা সত্ত্বেও সমাজতাত্ত্বিক পটভূমিকে গৌণ রেখে সাহিত্যের পর্যালোচনা চলতে পারে; কারণ, শিল্পকলার নিজস্ব সিলসিলার মধ্যে এমন কিছু গুরুতর বিশিষ্টতা সঞ্চিত হয় যে, তার মধ্যেই কোনো নতুন রচয়িতা যেমন চর্চা চালিয়ে যেতে পারেন, ঠিক তেমনি আলোচক-পর্যালোচকরাও সেসব নিরিখ ব্যবহার করে পাঠ করতে পারেন।

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস থেকেই এ বাবদ অসংখ্য উদাহরণ দেয়া যায়। বিশুদ্ধ ধর্মীয় কালাম হিসাবে রচিত চর্যাপদের পদগুলো যে পঠিত হয় মুখ্যত সাহিত্য হিসাবে, তা এরকম দৃষ্টান্ত। বৈষ্ণব পদাবলির অন্তত তিনশ বছরের ইতিহাসকে আমরা যে আঁটিয়ে ফেলি চৈতন্য-পূর্ব আর চৈতন্য-পরবর্তী বাস্তবতা-বিবরণীর এক অনুচ্ছেদে, তাও এরকম পাঠই বটে। এর মধ্য দিয়েও সাহিত্যপাঠ হয়, এবং অনেকক্ষেত্রে বেশ সন্তোষজনক মাত্রাতেই হয়। আমাদের বর্তমান আলোচনার জন্য অধিকতর ভালো উদাহরণ হবে তিরিশের দশকের রবীন্দ্রপাঠ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলোনিয়াল আধুনিকতা ও কলোনিয়াল জাতীয়তাবাদের গড়ন-যুগের সৃষ্টি এবং অন্যতম প্রধান কারিগর। উদারনৈতিক মানবতাবাদের 'মুখোশে' তিনি পশ্চিমকে আত্মস্থ করেছিলেন, আর প্রাচ্যবাদী সোনালি ভারতের আধারে সার্বিক বাণী উৎপাদনের মধ্য দিয়ে তাকে রূপান্তরিত করেছিলেন 'মুখশ্রী'তে। রবীন্দ্রনাথ আসলে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সবচেয়ে সক্রিয় মানুষ। 'কলা'র আবরণে আধুনিক ভারতের রাজনীতি, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও দর্শনের অন্যতম প্রধান ভাষ্যকার। এ রবীন্দ্রনাথই তিরিশের দশক ও তৎপরবর্তী চর্চায় রূপায়িত হয়েছেন এক মহান 'কলাকার' হিসাবে। দার্শনিক বা সমাজতাত্ত্বিক তৎপরতাকে প্রায় সম্পূর্ণ পাশ কাটিয়ে আধুনিকতাবাদী নন্দনতত্ত্বের প্রত্যক্ষ অভিভাবকত্বে প্রণয়ন করা সম্ভব হয়েছে এমন একজন রবীন্দ্রনাথকে, যিনি তাঁর যাবতীয় ভাবুকতা আর লিপ্ততাকে বন্ধক রেখেছেন ধ্যানমগ্ন 'কবি'র জোব্বায় ।

এখানে একটা সতর্কতামূলক টাকা দিয়ে রাখা দরকার। অন্য রবীন্দ্রনাথ, যেমন শিক্ষাদর্শন বা আর্থিক-দর্শনের রবীন্দ্রনাথ, নিয়ে আলাদা সন্দর্ভ যথেষ্ট রচিত হয়েছে; কিন্তু সাহিত্যের ভিত্তি বা পটভূমি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের এসব তৎপরতা কিভাবে ফলপ্রসূ হয়েছে, কিংবা এসব উপাদান কিভাবে রবীন্দ্র-সাহিত্যে নান্দনিক মূর্তি বা রূপ পরিগ্রহ করেছে, তা খুব একটা ব্যাখ্যাত হয় নাই। এমনকি যেগুলো কাব্যকলার তুলনামূলক অধিকতর নিকটাত্মীয় বলে গণ্য হতে পারে, সেগুলোর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। উদাহরণ হিসাবে বলা যাক, রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব ও উপস্থিতির ব্যাপকতা নিয়ে আলোচনা হয়েছে; কিন্তু প্রাচ্যবাদী চর্চার যে বাস্তবতায় সোনালি ভারতের প্রকল্পনা রবীন্দ্র-সাহিত্যের অন্যতম প্রধান ভরকেন্দ্র, তার নিরিখে পুনর্নির্মিত কালিদাসের প্রসঙ্গ খুব একটা উচ্চারিত হয় নাই।

কেন অন্য অনেক সম্ভাবনা মুলতবি রেখে গত অনেক দশক ধরে বাংলাভাষী সমালোচক ও পাঠকরা এ ধরনের রবীন্দ্রনাথকেই মুখ্যত নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ করেছেন, তার ব্যাখ্যা এখানে জরুরি নয়। কিন্তু এ উদাহরণের বরাত দিয়ে আমরা বলতে চাই, সাধারণভাবে নজরুলের ক্ষেত্রে এবং বিশেষভাবে অগ্নি-বীণার ক্ষেত্রে এ ধরনের ঘটনাই ঘটেছে। আবার ঘটনা মোটের উপর এক ধরনের হলেও *অগ্নি-বীণা* পাঠের ক্ষেত্রে তার ফল হয়েছে খুবই অন্যরকম। কারণ, উনিশ ও বিশ শতকের যে আর্থ-সামাজিক বাস্তবতায় বাংলা সমালোচনা-সাহিত্য ও সাহিত্যের ইতিহাস বিকশিত হয়েছে, তাতে

রবীন্দ্রনাথকে খুব সন্তোষজনকভাবে স্থাপন করা গেলেও নজরুল তার সাথে মোটেই খাপ খায় না (মোহাম্মদ আজম ২০১৩)। নাগরিক, ইংরেজি-শিক্ষিত, কলোনিয়াল-লিবারেল, হিন্দু-ভদ্রলোক শ্রেণির যে বর্গে আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে প্রায় নিঃশেষে আঁটিয়ে ফেলা যায়, নজরুল সম্পূর্ণতই তার বাইরের মানুষ। সে কারণেই অগ্নি-বীণার সমাজতাত্ত্বিক পটভূমিতে নতুন নান্দনিকতার ইশারা তালাশ করা দুরূহ হয়েছে। আমজনতার অভাবনীয় গ্রহীষ্ণুতার বিপরীতে সাহিত্যসেবীদের শীতল বিরূপতা তার সাক্ষ্য হয়ে আছে।

তিরিশের দশকের খাস কলকাত্তাই কবিরা নজরুলের ব্যাপারে মোটের উপর নিঃশব্দ ছিলেন। বাঙাল কবি জীবনানন্দ দাশ নজরুলের গুরুত্বের কথা বললেও এ কবিতায় নিজের অস্বস্তির কথা জানিয়েছেন। বুদ্ধদেব বসু নজরুল নিয়ে রীতিমতো লিপ্ততা দেখিয়েছেন। কিন্তু তাঁর লিপ্ততা ব্যক্তি-নজরুলকে ছাড়িয়ে কবিতা পর্যন্ত খুব একটা পৌছায়নি। আধুনিক বাংলা কবিতা সম্পাদনা করতে গিয়ে নজরুলের গান সংকলনের মধ্য দিয়ে তিনি নজরুল-কাব্য বিষয়ে নিজের অবস্থান স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করেছেন। কাজী আবদুল ওদুদ নজরুলকে 'যুগমানব' বলে অভিহিত করেছেন; কিন্তু কবিতা বিষয়ে তাঁর অবস্থান অনেকটা জীবনানন্দের অনুরূপ। এমনকি সুকান্ত ভট্টাচার্য, যিনি নজরুলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধমর্ণদের একজন, নজরুল নিয়ে প্রায় বিস্ময়কর নির্লিপ্ততা দেখিয়েছেন। অগ্নি-বীণার অভাবনীয় কবিতামালায় সমকালীন সাহিত্যসেবীদের এ বিরূপতা কোনো ষড়যন্ত্র বা সাম্প্রদায়িকতার ফল নয়; বরং নান্দনিকতা ও তার সমাজতাত্ত্বিক পটভূমিগত ভিন্নতা তথা অপরিচয়ই এর কারণ।

এ পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান আলোচনার ন্যায্যতা প্রতিপাদনের জন্য আমরা আপাত- বিপরীত কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পরস্পর-সম্পর্কিত দুটি প্রস্তাব উত্থাপন করতে চাই। প্রথমত, সমাজতাত্ত্বিক পটভূমি *অগ্নি-বীণা* পাঠের অপরিচয়জনিত বাধা দূর করে নন্দনতাত্ত্বিক উপভোগে সহায়ক হতে পারে। বাংলা কবিতার প্রভাবশালী শৈল্পিক সিলসিলায় পড়ে না বলে, কিংবা সমাজতাত্ত্বিক পটভূমি ভিন্ন হওয়ার কারণে এ কাব্যের ক্ষেত্রে এ ধরনের বিচার-বিশ্লেষণের গুরুত্ব অনেক বেশি। দ্বিতীয়ত, সমাজতাত্ত্বিক পটভূমি যথাসম্ভব উন্মোচিত হলে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে যে, যতটা ভাবা যায়, অথবা প্রভাবশালী ধারণা থেকে যতটা মনে হয়, অগ্নি-বীণার সমাজতাত্ত্বিক বাস্তবতা তত অচেনা নয়।

বাংলা সাহিত্যের উৎপাদক ও ভোক্তা শ্রেণির পূর্বতন ভূগোল ব্যবহার করেই *অগ্নি-বীণা* একে আড়ে-দিঘে অনেক দূর প্রসারিত করেছে। সমাজতাত্ত্বিক পটভূমির উন্মোচন নান্দনিক তত্ত্বতালাশের পাশাপাশি এ প্রসারিত ভূগোলের মানচিত্র প্রণয়নেও সাহায্য করতে পারে। তবে তার আগে কাব্যটির নান্দনিক নতুনত্বের সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়ন করা দরকার।

২.১

নান্দনিক বিবেচনায় অগ্নি-বীণার অন্যতম প্রধান বিশিষ্টতা এর সমকাললিপ্ততা। হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৯৩: ১১৫) লক্ষ করেছেন, 'তিনি [নজরুল] বাংলা কাব্যের হাতে বর্তমানকে তুলে দিয়েছেন'। কাব্যটির পঠন-পাঠনে সাধারণভাবে একে বিষয়গত দিক থেকেই বিবেচনা করা হয়; এবং হাসান হাফিজুর রহমানও অনেকটা সেভাবেই দেখেছেন। বিষয়ের দিক থেকে 'অকাব্যিক' হওয়া সত্ত্বেও অর্থাৎ স্থান-কালের সমসাময়িকতায় ভর দেয়া সত্ত্বেও নজরুলের কবিতা কাব্যিক আবেগ তৈরি করে এ বাস্তবতাকে তিনি দেখেছেন 'প্যারাডক্স' হিসাবে (১৯৯৩: ১১৮)। তিনি যদি একে নন্দনতাত্ত্বিক বর্গ হিসাবে বিবেচনা করতেন, তাহলে হয়ত অন্যতর সাফল্য হিসাবেই দেখতে পেতেন। আর আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পূর্ববর্তী চর্চার সাপেক্ষে বর্গটির গভীরতর তাৎপর্যের হদিশও দিতে পারতেন।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে – দেবেশ রায় (১৯৯১) দেখিয়েছেন – বাংলা সাহিত্য বাস্তবধর্মিতা ও সমকালীনতা পরিহার করে প্রবেশ করেছিল এক পরোক্ষতার ময়দানে, যেখানে অতীত ভিড় করেছিল মিথ, ইতিহাস আর রোমান্স-রোমান্টিকতার সুরতে। ওই পরোক্ষতার মধ্যেও সমকালকে নিশ্চয়ই শনাক্ত করা সম্ভব, যেমন *মেঘনাদবধ* কাব্যের ক্ষেত্রে আমরা করে থাকি, কিংবা যেমন কল্পনা কাব্যের অসামান্য বিশ্লেষণে সৈয়দ আলী আহসান (১৯৯১) দেখিয়েছেন; কিন্তু ওই দীর্ঘমেয়াদি চর্চার মধ্য দিয়ে এমন একটা নিরিখ বা মানদণ্ড স্থির হয়ে গিয়েছিল, যেখানে সমকাল বর্গটিই সাহিত্যিক নান্দনিকতার বিপরীতে কাজ করতে থাকে। বাস্তবতা হল, শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় আড়াল আর নির্বস্তুক মানদণ্ডে শিল্প-উপভোগের কান্টীয় নন্দনতত্ত্বের বাইরে বহু ঘরানা আছে, যেখানে সমকালীনতাকে কার্যকরভাবে সম্বোধন করতে পারার মহিমা জাহির আছে। উদাহরণ হিসাবে মিখাইল বাখতিনের কথা বলা যায়, যিনি বর্তমানময়তাকে আধুনিকতার অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন; আর এরকম নান্দনিক কায়দায় বর্তমানকে বশীভূত করতে পারার সক্ষমতার জন্যই উপন্যাসকে আধুনিক যুগের আঙ্গিক হিসাবে বর্ণনা করেছেন (মোহাম্মদ আজম ২০২৩) ।

অগ্নি-বীণা গভীরভাবে এবং বহুমাত্রিক অর্থে সমকালীন। রাখতিনীয় পরিভাষা মোতাবেক, এর ভাষা উপন্যাসিত বা নভেলাইজড; এ অর্থে যে, কবিভাষার অসামান্য বিশেষত্ব রক্ষা করেও সময় এবং স্থানের বিচিত্র স্বরের সংস্থানে কাব্যটি আগ্রহ ও সাফল্য দেখিয়েছে। অন্যদিকে, ওয়াল্টার বেনজামিনের (২০২০) কথা ধার করে বলতে পারি, এ সমকালীনতার প্রধান বৈশিষ্ট্য 'জনতার উত্থান'। সিনেমার নন্দনতত্ত্ব তালাশ করতে গিয়ে বেনজামিন লক্ষ করেছেন, 'মননশীল ও গভীর অনুধ্যানী ব্যক্তির বিপরীতে ইউরোপীয় সমাজে যে 'জনতার উত্থান' ঘটছিল, সিনেমা বস্তুত তারই অনুকূল শিল্পমাধ্যম। *অগ্নি-বীণার* কবিভাষা ও রূপকল্প সম্পর্কেও প্রায় অনুরূপ বলা চলে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের

প্রত্যক্ষতা, রুশ বিপ্লবের আঁচ আর মুসলমান জনগোষ্ঠীর মূলধারার রাজনীতিতে সম্পৃক্তির মধ্য দিয়ে যে নতুন জনতার আবির্ভাব ঘটেছিল ‘সমকালে’, এ কাব্যে পাওয়া যায় তার তীব্রতম নান্দনিক প্রকাশ।

‘নজরুল প্রথম বাঙালি কবি যিনি বিশুদ্ধ ক্রোধকে কবিতায় রূপান্তরিত করেছেন’ (সরোজ ২০০০: ১২১)। প্রধানত সমকালকে যথার্থ ও ন্যায্য ভাষায় পরিস্ফুট করার স্বার্থেই *অগ্নি-বীণা* ক্রোধকে অবলম্বন করেছিল। বাংলা কবিতার পূর্বতন ভাষা ছিল মুখ্যত শান্ত-সমাহিত। তাতে সম্ভাবনার আবাহন ছিল; ছিল আদর্শ অবস্থার প্রস্তাবনা। কিন্তু পরিবর্তিত বাস্তবতায় দরকারি হয়ে উঠেছিল পেশল অজাচার আর অসংযমের বেহিসাবি প্রকাশ। অগ্নি-বীণার কবিভাষায় বীররস আর বীভৎস রসের যৌথতায় ভেঙে পড়েছিল ভিক্টোরীয় সুমিতির বন্ধন। বাংলা কাব্যভাষা তাতে সম্পূর্ণ নতুন রূপ পরিগ্রহ করল। মুজফ্ফর আহমদ লিখেছেন:

> আমাদের বাঙলা ভাষা চিরদিন নজরুল ইসলামের নিকট ঋণী থাকবে। আমাদের ভাষা মিষ্ট। আমাদের ভাষা সুকোমল। শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতা আমাদের ভাষায় রচিত হতে পারে এই ছিল আমাদের ধারণা। আমাদের ভাষায় জোর নেই, সংগ্রামশীলতা নেই, এই ধারণা আমাদের মধ্যে বদ্ধমূল ছিল বলেই আমরা শ্লোগান দিতাম হিন্দুস্থানিতে। নজরুল ইসলামের অভ্যুদয়ের পর আমরা বুঝেছি যে, বাঙলা ভাষাও জোরালো, সংগ্রামশীল ও অসীম শক্তিশালিনী। নজরুলের সামরিক শিক্ষা ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা মিশে যাওয়ায় তার কলম হতে এত জোরালো ভাষা বের হওয়া সম্ভব হয়েছে। (মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ১৯৯৯: ৯৭)

এই যে সমকাল-লিপ্ততা আর ক্রোধের অসংযমী প্রকাশ – দুইয়েরই ভিত্তি বিশেষ বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গির সংস্থান। বস্তুকে বস্তু-স্বরূপে মূল্য দিতে পারা আর ইন্দ্রিয়বৃত্তির স্বীকৃতি এ দুই উপাদানের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত। কল্পনার বিপরীতে বাস্তবের জয়গান আর বস্তুর শরীরী সত্তার স্বীকৃতি দেখা দিয়েছিল যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায়। কিন্তু তাঁদের কাব্যে এসব উপকরণ কোনো অন্যতর লক্ষ্যে সংযোজিত হয়নি। বলা যায়, উপায়ই ছিল সেখানে লক্ষ্য। ‘ধূমকেতু’র মতো কবিতার সাক্ষ্য থেকে নিশ্চিন্তে বলা যায়, অগ্নি-বীণায় একদিকে বিশিষ্ট বাস্তববাদ, বস্তুমূল্য আর ইন্দ্রিয়বৃত্তি পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হল, অন্যদিকে ‘উপায়’কে ছাড়িয়ে ‘লক্ষ্য’ কবিতার দেহ-মনে লীন হয়ে নতুন সৌন্দর্যে অধিষ্ঠিত হল। বাংলা কাব্যভাষার ‘প্রগতি’র দিক থেকে এটা নিঃসন্দেহে বড় ঘটনা।

২.২

অগ্নি-বীণা কাব্যের দ্বিতীয় যে নান্দনিক অর্জনের উল্লেখ করতে চাই তা হল, হিন্দু-মুসলমান যৌথ সংস্কৃতির উপস্থাপনা এবং ব্যতিক্রমহীনভাবে অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রকাশ। এ দিক

থেকে *অগ্নি-বীণা* তথা নজরুল-সাহিত্য আধুনিক বাংলা কাব্যধারার সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ঐতিহাসিক বিচারে এ ঘটনার গুরুত্ব বোঝার জন্য আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের খবর নেয়া দরকার। মধ্যযুগের কয়েকশ বছরের সামবায়িক সাধনায় বাংলা সাহিত্যে হিন্দু ও মুসলমান ঐতিহ্য প্রকাশের কার্যকর ধারা তৈয়ার হয়েছিল। তাতে দুই পক্ষের সাহিত্যিকদের - সমপর্যায়ের না হলেও - অংশগ্রহণ ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যাক, বটতলার সাহিত্যে এক ধরনের যৌথ ভাষা এবং যৌথ জনসংস্কৃতির প্রতিফলন পাওয়া যায়। যাকে ব্যাপকভাবে পরে 'দোভাষী পুথি' বা 'মুসলমানি বাংলা' বলা হয়েছে, উনিশ শতকের অন্তত প্রথমাংশ জুড়ে বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান সমাজে সেই ভাষার রচনা বিপুল পরিমাণে রচিত ও পঠিত হয়েছে। গোলে বকাওলি, ইছফ জোলেখা, লায়লি মজনু, সাহানামা প্রভৃতি জনপ্রিয় বইয়ের অনুবাদক, প্রকাশক আর ভোক্তার তালিকায় হিন্দুর সংখ্যা ছিল প্রচুর (গৌতম ২০১১: ২২৫-৩০; সুমন্ত ২০১১: ১১৮)। ইংরেজ আমলে নতুন শিক্ষিত মধ্যবিত্তের নতুন সাহিত্যচর্চার কালে ওই পুরনো ঐক্যের ধারা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। দীপেশ চক্রবর্তী (২০০২) তাঁর হ্যাবিটেশন অব মডার্নিটি বইয়ের অন্তর্গত 'মেমরিজ অব ডিসপ্লেসমেন্ট: দ্য পোয়েটি অ্যান্ড প্রেজুডিস অব ডুয়েলিং' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, বাঙালি ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ তাঁবে গড়ে ওঠা আধুনিক বাংলা সাহিত্যে যে 'ঘরের কথা' লেখা হল, তাতে মুসলমান সমাজ পুরোপুরি বাদ পড়ল। 'বাদ পড়া' বলতে কী বোঝায়, তিনি তার গভীর বিশ্লেষণ করেছেন। সুদীপ্ত কবিরাজ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কে সারগর্ভ দীর্ঘ নিবন্ধে লিখেছেন:

> In the age of Rammohan Roy (1774-1833), cultivation of an upper-class Bengali included a mandatory initiation into Islamic culture and a fluent grasp of Persian. By the time of Rabindranath Tagore (1861-1941), roughly a century later, literary high culture had gone through a striking conversion to become a more solidly Hindu sphere. (Kaviraj 2003: 531)

এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে নজরুল পালন করেন বিপ্লবী ভূমিকা। তিনি আগের প্রায় একশ বছরে কলকাতায় 'জমে ওঠা কাব্যভাষা নিঃসংশয়ে ব্যবহার করলেন, একই সাথে মুসলমান সমাজের ভাষা ও সংস্কৃতিকে অকুণ্ঠিত সামর্থ্যে মূলধারার সাহিত্যে নিয়ে এলেন। আহমদ ছফা (২০০২: ১৩১) নজরুলের এই তাৎপর্যপূর্ণ অবদানের সারসংক্ষেপ করেছেন এভাবে:

> নজরুলের কাছে বাঙালী মুসলমান সমাজের অন্যতম প্রধান প্রণিধানযোগ্য ঋণ এই যে, নজরুল তাদের 'ভাষাহীন' পরিচয় ঘুচিয়ে দিয়ে তাদের সামাজিক ভাষাকে সাহিত্যসৃষ্টির ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা দান করলেন এবং স্বীকৃতি অর্জন করে দিলেন। আর নজরুলের কাছে সমগ্র বাঙালি সমাজের ঋণ এই যে, নজরুল বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যকে বাংলার হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ভাষা হিসেবে চিহ্নিত করে নব বিকাশধারায় ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে অনেকদূর পর্যন্ত গাঁথুনি নির্মাণ করেছিলেন।

নজরুলের ক্ষেত্রে এই ভাষিক যৌথতা কোনো আলগা উপাদান ছিল না, কিংবা অলংকারবিশেষ ছিল না। এ ছিল তাঁর শৈল্পিক-নান্দনিক সত্তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তৎসমবহুল বাংলার গাম্ভীর্য, ধ্বনিগৌরব আর নৃত্যপরতা তাঁর কবিভাষার অন্যতম প্রধান সম্পদ। তাঁর কাব্যকলার সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ নায়ক শিব – শিবের তাণ্ডবনৃত্যের ইমেজ অগ্নি-বীণার অনেকগুলো কবিতার প্রধান নান্দনিক প্রেরণা। 'প্রলয়োল্লাস', 'বিদ্রোহী', 'ধূমকেতু' ইত্যাদি কবিতা সংস্কৃত-বাংলার গাম্ভীর্য আর তাণ্ডবনৃত্যের নিপুণ যৌথতার দৃষ্টান্ত। অন্যদিকে দোভাষী পুঁথি এবং হিন্দুস্থানি ভাষার নৈকট্যে সমৃদ্ধ মুসলমান সমাজের ভাষার একটা জনগ্রাহ্য রূপও তাঁর কবিতার গুরুত্বপূর্ণ একাংশের ভিত্তি তৈয়ার করেছে। অগ্নি-বীণায় এরূপ নান্দনিকতার নিঃসংশয় নজির হয়ে আছে 'খেয়া-পারের তরণী', 'মোহরম' ইত্যাদি কবিতা। ইসলামি বিশ্বাসব্যবস্থা, আচার ও ঐতিহ্যের কাব্যিক ইমেজ নিপুণ সৌন্দর্যে ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়েছে এ কাব্যে।

বলার কথা হল, হিন্দু-মুসলমান ভাষা ও সংস্কৃতির যৌথতা *অগ্নি-বীণার* অন্তরঙ্গ উপাদান; আর এটা মোটেই কেবল বিষয়গত সংযোজন নয়, যেমনটা প্রায়ই ভাবা হয়ে থাকে। বরং ভাষিক আনুকূল্যে কয়েক ধাপ রূপান্তরের মধ্য দিয়ে কাব্যিক ইমেজে রূপান্তরিত হওয়াতেই এ ধরনের কাব্যকলার সিদ্ধি। *অগ্নি-বীণায়* - এবং নজরুলেরই আরো কোনো কোনো কবিতায় - এ অভাবনীয় ঘটনা ঘটেছিল। এ কথা প্রায়ই বলা হয়, 'সমগ্র আধুনিক বাংলা কাব্যের ইতিহাসে কাজী নজরুল ইসলামই একমাত্র কবি যিনি সমান দক্ষতার সঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান উভয় ঐতিহ্যকে আপন কাব্যে ব্যবহার করতে সমর্থ হয়েছেন' (মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ১৩৭৯: একষট্টি)। একজন কবির পক্ষে এটা কেবল তখনই সম্ভব, যখন জীবনযাপন ও সার্বিক উপলব্ধির 'অচেতন-অবচেতন' ওইভাবে গঠিত হয়। চর্চার এই ধরনের মধ্য দিয়ে তিনি আসলে বৃহত্তর বাঙালি সমাজে কাজী আবদুল ওদুদ-বর্ণিত 'নবসংস্কৃতি'র সূচনা করেছিলেন, যাকে আমরা আধুনিক বাঙালির সংস্কৃতি হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি। বস্তুত নজরুলই 'আধুনিক বাঙালীর প্রথম এবং এ যাবৎকালের শ্রেষ্ঠ রূপকার' (মুহম্মদ নূরুল ১৩৯৫: ৪০)। কাজী নজরুল ইসলামকে যে অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রতীক হিসাবে ভাবা হয় তাতে একবিন্দু অতিরঞ্জন নাই। সাথে আরো যোগ করা দরকার, এ ব্যাপারে তাঁর সাথে তুলনীয় কোনো ব্যক্তিত্ব বাঙালি সমাজে আগে বা পরে আর কখনোই জন্মাননি।

একে 'বাঙালি সংস্কৃতি' বা 'অসাম্প্রদায়িক চেতনা জনিত শুভকামনা হিসাবে দেখার কারণেই কাব্যভাষাজনিত অর্জনটি খুব একটা খুঁটিয়ে দেখা হয়নি। প্রকৃত প্রস্তাবে অগ্নি-বীণার অনেকগুলো কবিতা যৌথ অচেতনকে সচেতনতার ইমেজে রূপান্তরের সাফল্যে ভাস্বর। প্রতিটি ক্ষেত্রেই এ রূপান্তরের ঘটনা ঘটেছে কয়েক ধাপে। 'আগমনী' কবিতায় দেবী দুর্গার আবাহন ও সংশ্লিষ্ট প্রচলিত ইমেজগুলো শেষ ধাপে প্রকাশিত হয়েছে মহাযুদ্ধের রণ-দামামায়। মধ্যবর্তী অনেকগুলো স্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বর্তমান

দুর্যোগের সাথে তার সম্পর্ক, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পূর্বানুমান এবং মানবকেন্দ্রিক প্রকৃত জীবনযাপনের সাথে সম্পর্কিত বহুমাত্রিক ফয়সালা। কবিতাটির শাব্দ- অবয়ব আর ধ্বনি- ব্যঞ্জনা নির্ধারিত-নির্মিত হয়েছে ওই অন্তর্নিহিত অভীপ্সার অনুকূলে। কাজেই শুধু মিথের পুনর্নির্মাণ কিংবা ব্রিটিশ-বিরোধী জাতীয়তাবাদী আকাঙ্ক্ষার বরাতে এ কবিতার শব্দস্বভাব ও কাব্যিক ইমেজ বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। বহু ধাপে রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যে সামগ্রিক কবি- ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার নিরিখেই এ নান্দনিকতার তালাশ করতে হবে।

২.৩

অগ্নি-বীণা হাজির করেছে বাংলা সাহিত্যের প্রথম ও একমাত্র বিপ্লবী ইমেজ। এর দোসর পাওয়া যাবে কেবল নজরুলেরই আরো কিছু কবিতায়, যার বড় অংশ এ কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ডে মুদ্রিত হবে বলে কাব্যটির ভূমিকায় লেখক স্বয়ং ঘোষণা করেছিলেন। বিপ্লব একটি রাজনৈতিক ও দার্শনিক বর্গ। এর বাইরে বিপ্লবী মুহূর্তের কিছু পূর্বশর্ত থাকে; থাকে ঘটমানতা ও বিপ্লব-পরবর্তী আশাবাদ। এর প্রতিটি অঙ্গই অগ্নি-বীণার কবিতাগুলোতে কাব্যভাষার বদান্যতায় কাব্যিক ইমেজে প্রকাশিত হয়েছে। ছাঁচাছোলা বিপ্লবী ইমেজের সাথে নজরুল নিপুণভাবে যুক্ত করেছেন ব্রিটিশ-বিরোধী লড়াইয়ের সম্ভাব্য পরম রূপ, আর বিপ্লবের নৈতিক-দার্শনিক ভিত্তি। সমালোচকগণ এ দুটি দিক বিশদভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, কিন্তু সাধারণভাবে আবশ্যিক নজরুলীয় বর্গ হিসাবে 'বিপ্লব' গত একশ বছর প্রায় অনুল্লেখিতই থেকে গেছে। 'বিদ্রোহ' বর্গটার উপর অধিকতর জোর-পড়া এর অন্যতম কারণ।

এ কাব্যের প্রথম কবিতা 'প্রলয়োল্লাস' বস্তুত সর্বাত্মক বিপ্লবের প্রস্তাবনা। এখানে ধ্বংস ও সৃষ্টির কথা আছে; মানুষের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কথা আছে; আছে সে পরিবর্তনের নৈতিক-দার্শনিক প্রস্তাব। কবিতা থেকে একটা অংশ উদ্ধৃত করা যাক:

ঐ সে মহাকাল- সারথি রক্ত তড়িত-চাবুক হানে,
রণিয়ে ওঠে হেষার কাঁদন বজ্র-গানে ঝড়-তুফানে!
খুরের দাপট তারায় লেগে উল্কা ছুটায় নীল খিলানে!
গগন-তলের নীল খিলানে।
অন্ধ কারার বন্ধ কূপে
দেবতা বাঁধা যজ্ঞ-যুপে
পাষাণ-স্তূপে!
এই তো রে তার আসার সময় ঐ রথ-ঘর্ঘর
শোনা যায় ঐ রথ ঘর্ঘর।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর

'রণিয়ে ওঠে হেষার কাঁদন বজ্র-গানে ঝড়-তুফানে পক্তিটি পরীক্ষা করলে বিপ্লবী ইমেজ হিসাবে কবিতাটি পড়ার গভীরতর তাৎপর্য উন্মোচিত হবে। 'রণিয়ে ওঠে এক পরিকল্পিত শ্রুতি-ইমেজ, যা যুদ্ধের বিশদ ছবি প্রকাশ করে। অন্যদিকে রণলিপ্ত অশ্বের 'কাঁদন' কথ টো প্রসারিত তাৎপর্য পায়, যদি বিপ্লবী ধ্বংসযজ্ঞের পেছনে কাজ-করা নৈতিক-দার্শনিক পটভূমির কথাটা মনে রাখি। 'বজ্র-গান' ও 'ঝড়-তুফান দুটিই যুদ্ধ, ধ্বংস ও বিশৃঙ্খলার স্মারক - সেও বিপ্লবের সাধারণ চিত্র। পরের ছবিতে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড অসীম বিস্তৃতি পায়। আকাশে উল্কাপাতের নতুন কার্যকারণ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে, আর তাকে নীল আকাশের পটভূমিতে স্থাপন করে কবি সাধারণ ছবিকে উন্নীত করেন বিপ্লবের চিত্রকল্পে। পুরো ছবিটি অঙ্কিত হয় মহাকালের সক্রিয়তায়। তার রথযাত্রার প্রকট আওয়াজ কানে আসার সময় সমাগত; কারণ সবচেয়ে আশা-জাগানিয়া ক্ষেত্রগুলোও আজ অন্ধকারের পাষাণস্তূপে বন্দি। রথে আসীন মহাকালের চিত্রকল্পে রবীন্দ্রনাথের রাজার প্রতিধ্বনি পাওয়া অসম্ভব নয়। তবে ওই সাম্য যদি কল্পিত হয়ও, দুয়ের ফারাকটাই তাতে বড় হয়ে ওঠে। সদৃশ ইমেজের মধ্যে প্রকটিত হয় 'ইভোল্যুশনে'র সাথে 'রেভল্যুশনে'র ফারাক।

'ধূমকেতু' কবিতাটি বিপ্লবী তৎপরতাজনিত ধ্বংসযজ্ঞের বিশৃঙ্খল উদযাপন। অবশ্য বিপ্লবী পক্ষের উল্লাসের বিপরীতে শত্রুপক্ষও এখানে হাজির। *অগ্নি-বীণা* কাব্যের অধিকাংশ কবিতার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট প্রতিপক্ষ শনাক্ত করা সম্ভব। কবিতাগুলোর এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এই যে, নিছক ঔপনিবেশিক শাসন বা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ইত্যাদি সংজ্ঞা ব্যবহারের বদলে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে সংজ্ঞায়ন ঘটেছে; অর্থাৎ শত্রুপক্ষ যে কারণে শত্রু, তার ইশারা আছে। আর এভাবেই কবিতাগুলো অব্যবহিত লক্ষ্যের সীমা ছাড়িয়ে সুদূর ভবিষ্যতেও প্রাসঙ্গিক থাকার সক্ষমতা বাড়িয়েছে। 'খেয়া-পারের তরণী' কবিতায় কেয়ামতের ঘনঘোর অমানিশা চিত্রায়ণের ছলে এমন এক অন্ধকারের প্রমূর্তি চিরকালীন মহিমা পেয়েছে, যা আসলে বিপ্লবী মুহূর্তের পূর্বশর্ত। 'বিদ্রোহী' কবিতাটির যাবতীয় পাঠে 'বিদ্রোহ' এতটাই প্রতাপশালী যে, সমস্ত প্রত্যক্ষতা থাকার পরেও এ কবিতার পাঠে বিপ্লবী তাৎপর্য কখনোই প্রধান হয়ে ওঠেনি। ধ্বংস ও সৃষ্টির ইমেজ-যে নজরুলের এ পর্বের কবিতার প্রধান প্রণোদনা, সে কথা বারবার বলা হয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক-দার্শনিক-নৈতিক প্রকল্প হিসাবে বিপ্লবের কথাটা প্রচারিত হয়নি। আমাদের প্রভাবশালী ডিসকোর্সে বিপ্লবী তৎপরতার গরহাজিরাই হয়ত এর প্রধান কারণ। কিংবা বলা ভালো, পদ্ধতিমাফিক মার্কসীয় বিপ্লবের ইমেজ আমাদের মনোজগতে প্রবলভাবে অধিষ্ঠিত থাকায় নজরুলের এ অসামান্য কাব্যকলা দৃষ্টির অগোচরে থেকে গেছে ।

২.৪

বহিরঙ্গে *অগ্নি-বীণা* কাব্যের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য তার সঙ্গীতময়তা। শব্দালঙ্কার, অন্ত্য ও মধ্যমিল, নৃত্যপর ছন্দের কুশলী বিন্যাস আর ধ্বন্যাত্মক শব্দের দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রতুলতা

সে ভাষার প্রধান অবলম্বন। অন্তরঙ্গেও কবিতাগুলোর প্রধান অবলম্বন সুর, আর সুরের পৃষ্ঠপোষকতায় জমে ওঠা গতি। অনেকগুলো কবিতায় সুরের অধীনেই কবি শব্দ-সঞ্চয় করেছেন। অর্থের তুলনায় সুরই সেখানে প্রাধান্য পেয়েছে। সুরের উচ্চ নিনাদে বীররসের সঙ্গতি রক্ষার খাতিরে তিনি আমদানি করেছেন বাংলা কবিতার নতুন শব্দস্বভাব, যা 'বাংলা কবিতার বহুদিনকার অলস শব্দসুষমার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ' (সৈয়দ আলী ১৯৯৩: ৮)। সৈয়দ আলী আহসান (১৯৯৩: ৯) আরো লিখেছেন:

> শব্দকে কাজী নজরুল ইসলাম একটি প্রবল স্রোতধারার প্রবাহের মতো ব্যবহার করেছেন যে ভঙ্গিকে ইডিথ সিটওয়েল পর্বত শিখর থেকে নিম্নভূমিতে গড়িয়ে পড়ার ভঙ্গি বলে আখ্যাত করেছেন। একটি প্রবল প্রবাহে যেমন কোনো বিশেষ অঞ্চল অথবা উপলখণ্ড অথবা ভঙ্গুর তরঙ্গচূর্ণ কোনোটাই বিশেষভাবে চোখে পড়ে না, চোখে পড়ে শুধু একটি তীব্র যাত্রা, তেমনি নজরুল ইসলামের 'অগ্নি-বীণা'য় কোনো বিশেষ শব্দ, কোনো চরণ অথবা কোনো স্তবক বিশেষ মূল্য লাভ করেনি। বিচ্ছিন্নভাবে কোনোটাই আমাদের শ্রুতিগোচর অথবা নয়নগোচর হয় না। কিন্তু প্রতিটি কবিতায় স্রোতধারার মতো একটি প্রবল গতি আমরা লক্ষ করি। একটি কবিতায় সমগ্রভাবে এ গতিটি আমাদের শ্রুতি এবং অনুভূতিতে জাগে।

এ বর্ণনায় অগ্নি-বীণার শব্দ-স্বভাবের খুব নিগূঢ় কিছু বিশিষ্টতা উন্মোচিত হয়েছে। তবে গতি ও প্রবাহের দিকে নজর দিতে গিয়ে এখানে ইমেজ ও অর্থগত তাৎপর্য বাদ পড়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ কাব্য একইসাথে চিত্রাত্মক ও ধ্বন্যাত্মক। চিত্র ও চিত্রকল্পের ভিতর দিয়ে শ্রুতি-প্রধান বোধি ও অনুভূতি সঞ্চার করাই এর লক্ষ্য। এ বাস্তবতা শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাথে কবিতার পুরনো সখ্যের কথাই মনে করিয়ে দেয়। ছাপাখানার আধিপত্যের মধ্যে শিল্পভোগের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের যে রূপান্তর ঘটেছে, অর্থাৎ, শ্রুতির পরিবর্তে যেভাবে দৃষ্টির প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছে, তার ইতিহাস মনে রাখলে আধুনিক কবিতায় চিত্রকল্পের প্রাধান্যের ব্যাপারটিও বোঝা যাবে, আর ভিন্ন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কান-নির্ভর কবিতার তাৎপর্যও আন্দাজ করা যাবে। অগ্নি-বীণার কাব্যভাষায় এ দুইয়ের সর্বোত্তম সমন্বয় ঘটেছিল।

এ কারণেই কবিতাগুলো ব্যক্তিগত পাঠের পাশাপাশি সামষ্টিক উপভোগেরও শিল্প। ব্যক্তিগত পাঠের সাহিত্য সাহিত্যের একটি ধরন মাত্র, এবং অবশ্যই প্রভাবশালী ও উপযোগী ধরন, যা বিকশিত হয়েছে শিল্পবিপ্লবোত্তর উৎপাদন সম্পর্কের বিশেষ স্তরে। কিন্তু এর বাইরেও কবিতার আছে অসংখ্য ধরন, ব্যবহার ও উপযোগিতা। *অগ্নি-বীণা* মুখ্যত কাজ করেছে সামষ্টিক মনস্তত্ত্ব নিয়ে, কবিতার উচ্চারণরীতিতে এনেছে সেই বিশিষ্টতা, যার দৌলতে দশের কথা দশকে সহসাই স্পর্শ করে যায়। পুরো ব্যাপারটি আমাদের পূর্ব-কথিত 'জনতার উত্থানে'র সাথে নিগূঢ়ভাবে সম্পর্কিত।

৩.১

উপরে অগ্নি-বীণার সামগ্রিক নান্দনিকতার যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হয়েছে তার ভিত্তিতে নিশ্চিত করে বলা যায়, বাংলা কবিতার সমকালীন ধারাপ্রবাহের সাথে নানারূপ ঐক্য থাকলেও এতে এমন কিছু বিশিষ্টতা সঞ্চিত সঞ্চারিত হয়েছে, যাকে কাব্যভাষার দিক থেকে খুব আলাদা হিসাবেই চিহ্নিত করতে হবে। সাধারণত ব্যক্তি-প্রতিভার উপর ভিত্তি করে এ ধরনের স্বাতন্ত্র্যের কার্যকারণ নির্দেশ করা হয়। কিন্তু আমাদের প্রস্তাব অনুযায়ী, কিছুটা কাব্যভাষার ধারাবাহিকতা হিসাবে, আর শ্রেষ্ঠাংশে সমাজতাত্ত্বিক পটভূমির ভিত্তিতে কার্যকরভাবে এসব নান্দনিক বিশিষ্টতার তত্ত্বতালাশ করা সম্ভব।

রানির শাসনের সন্তুষ্টি আর ভিক্টোরীয় মূল্যবোধের পরিমণ্ডলে যে উদারনৈতিক মানবতাবাদী নিশ্চয়তায় আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ধ্রুপদি চর্চা হচ্ছিল, বিশ শতকের গোড়ায় তাতে বড় ধরনের বিঘ্ন উপস্থিত হয়। স্বদেশি আন্দোলন পূর্বতন শান্ত-সমাহিত আবহে গুরুতর ছেদ তৈরি করে। এর মধ্যে উপস্থিত হয় প্রথম মহাযুদ্ধ, যা খোদ ইউরোপীয় মনিবশ্রেণির মধ্যেই আলোকায়ন এবং যুক্তিনির্ভর সভ্যতার মহাবয়ান বিষয়ে মারাত্মক সংশয় তৈরি করে। দ্বিতীয় দশকের শেষদিকে ব্রিটিশ ভারতীয় মধ্যবিত্ত সমাজ প্রথমবারের মতো গান্ধির নেতৃত্বে প্রবেশ করে প্রত্যক্ষ রাজনীতির ময়দানে। অসহযোগ আন্দোলন ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান প্রভাবশালী রাজনৈতিক তৎপরতা হিসাবে বিকশিত হয়। এর সাথে খেলাফত আন্দোলনের সংযোগ মুসলমান সমাজের অন্তর্ভুক্তির মধ্য দিয়ে এ আন্দোলনকে এক ধরনের সর্বভারতীয় রূপ দিয়েছিল।

রাজনীতির অঙ্গনে এভাবে একদিকে ‘বর্তমানময়তা’ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, অন্যদিকে মধ্যবিত্ত পরিসরে আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় রাজনীতিমনস্ক মানুষের সক্রিয়তা লক্ষ করা গেছে। সমসাময়িক বিশ্ব-পরিস্থিতির সাথে তাল রেখে গণমানুষের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাও গভীরতা লাভ করছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের কালে দুনিয়ার দেশে দেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দানা বাঁধে, এবং বহু দেশ স্বাধীনতার জন্য লড়াই শুরু করে। তদুপরি ১৯১৭-র রুশ বিপ্লব জনমানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ও সম্ভাবনাকে এক অন্যতর গভীরতায় নিয়ে যায়। বাংলার ‘সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন একবার জোরদার হয়েছিল শতাব্দীর শুরুতে। বিশের দশকের গোড়ায় নতুন জাতীয়তাবাদী চেতনার অংশ হিসাবে ওই আন্দোলনের নতুন পর্ব শুরু হয়েছিল।

এ নতুন ‘জনতা’ কী গভীরভাবে নতুন কালের আকাঙ্ক্ষায় সাড়া দিয়েছিল, তার এক প্রত্যক্ষ প্রমাণ অর্ধ-সাপ্তাহিক ধূমকেতু (১৯২২) পত্রিকার প্রকাশ ও প্রচার। এ পত্রিকা কালের দিক থেকে অগ্নি-বীণার সমসাময়িক; আর ভাবের দিক থেকেও এ দুয়ের সাযুজ্য খুব গভীর। ধূমকেতু পত্রিকায় তীব্র সক্রিয়তা দেখিয়েছিলেন লেখক ও পাঠকেরা; আর নজরুল তার যোগ্য সারথি হিসাবে এক টগবগে জনসম্পৃক্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে

ধ্রুপদি মহিমা দিয়েছিলেন স্বল্পস্থায়ী স্বল্পপরিসর এ পত্রিকার পাতায় পাতায়। প্রতিনিধি-স্থানীয় উদাহরণ হিসাবে ধূমকেতুকে আমলে এনে বলা যায়, রাজনীতিমনস্ক এবং স্বাধীনতা-আকাঙ্ক্ষী যে জনতার উত্থানের চিহ্ন হয়ে আছে পত্রিকাটি, ঠিক তারই তীব্রতম নান্দনিক প্রকাশ ঘটেছে অগ্নি-বীণার অধিকাংশ কবিতার ছত্রে ছত্রে।

হুমায়ুন কবির (২০০২) যথার্থই বলেছেন, নজরুল অসহযোগ আন্দোলনের কবি। তবে এর সাথে খেলাফত আন্দোলনের কথা যুক্ত করলে অগ্নি-বীণার অনেকগুলো কবিতার পটভূমি তালাশ করতে সুবিধা হয়। অবশ্য অসহযোগ-খেলাফতের মতো তুলনামূলক নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে অপেক্ষাকৃত বিপ্লবী পক্ষগুলোর জোশ যুক্ত না করলে আলোচ্য কবিতাগুলোর তীব্রতাকে স্পর্শ করা যাবে না। এর মধ্যে দেশীয় পটভূমিতে ক্রিয়াশীল 'সন্ত্রাসবাদী' আন্দোলন আর স্বরাজের আকাঙ্ক্ষার কথা আগেই বলেছি। তার সাথে গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিতে হবে রুশ বিপ্লবের অনুপ্রেরণা আর কামাল পাশার রণনৈতিক-রাজনৈতিক সাফল্য। খেলাফত মুভমেন্টের প্যান-ইসলামিক বৈশিষ্ট্যের কথা আমাদের মূলধারায় যতটা উচ্চারিত-আলোচিত হয়েছে, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লড়াইয়ের প্রেরণা হিসাবে আন্দোলনটি তার সিকিভাগও বর্ণিত হয়নি। কিন্তু সত্য হল, বিজিত তুরস্ক আরো আগে থেকেই ব্যাপকভাবে অনুভূত হচ্ছিল মজলুম জনপদ হিসাবে; আর ভারতীয় মুসলমান-সমাজ তো বটেই, এমনকি বঙ্গীয় মুসলমানের 'শিক্ষিত' মধ্যবিত্ত অংশও কামালি বিপ্লবে অভাবনীয় সমর্থন জ্ঞাপন করেছিল। নজরুল এ আবহে কতটা উদ্দীপ্ত ছিলেন, তার প্রত্যক্ষ নজির অগ্নি-বীণার অন্তত তিনটি কবিতা – 'কামাল পাশা', 'আনোয়ার' ও 'রণ-ভেরী'। ওই তিন কবিতায় তাঁর যে পক্ষপাত ও উচ্চারণভঙ্গি, আর স্বদেশি স্বাধীনতা-কামনার সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত করে ওই 'বিদেশ'কে উপস্থাপনায় তাঁর যে মুনশিয়ানা, তাতে পরিষ্কারভাবে অগ্নি-বীণার সমকালীনতায় নজরুলের বিশ্বদৃষ্টির প্রতিফলন আছে। আরো আছে উনিশশ বিশের দশকের গোড়ায় প্রবলভাবে জমে ওঠা বিপ্লবী চেতনা। উপলব্ধ সমকালকে প্রবল ক্রোধ আর বিপ্লবী জোশে উপস্থাপনার যাবতীয় বাস্তবতা উপস্থিত ছিল অগ্নি-বীণার পটভূমিতে।

৩.২

অগ্নি-বীণার কবিতাগুলোতে হিন্দু-মুসলমান যৌথতার যে নান্দনিক প্রকাশ দেখি, যুগসত্য হিসাবে তাকে ব্যাখ্যা করা চলে। বাঙালির 'জাতীয় জীবনের দিক থেকে তখন সম্প্রদায়গত মেশামিশির একটা উপলক্ষ তৈয়ার হয়েছিল। খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের ক্ষণস্থায়ী মিলনমেলা বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছিল। ব্যাপারটা যে প্রধানত ব্যক্তির গুণ নয় তার এক প্রমাণ এই যে, বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের মধ্যে এই আকাঙ্ক্ষা বিপুলভাবে দেখা গেলেও বাঙালি হিন্দুর মধ্যে তার প্রকাশ অতটা প্রবল নয়। রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক মেলামেশার ঔদার্য বাঙালি হিন্দুও

দেখিয়েছিল, তার প্রমাণ চিত্তরঞ্জন দাশ। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের মিলনাকাঙ্ক্ষায় সাড়া দেয়ার মতো কোনো সাহিত্যিক প্রতিনিধি বাঙালি হিন্দু-সমাজে পাওয়া যায় না। মিলনের আকাঙ্ক্ষাটা 'পশ্চাৎপদ' নতুন-উদ্ভূত মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজে বিশেষভাবে প্রবল হয়ে উঠেছিল। নজরুল ছাড়াও আরেক কবি জসীমউদ্দীন এবং শিখা গোষ্ঠীর তরুণ চিন্তকদের মধ্যে তার ঐতিহাসিক সাক্ষ্য চিরকালের মতো সঞ্চিত হয়ে আছে।

তবে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে একটা সমন্বয়ধর্ম আর মিলনাকাঙ্ক্ষা স্ফুট হয়ে উঠছিল আগের প্রজন্ম থেকেই। উনিশ শতকের শেষাংশেই বাঙালি হিন্দু শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে নব-উদ্ভূত নগণ্য-সংখ্যক শিক্ষিত মুসলমান মধ্যবিত্তের জন্য একপ্রকার সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায় । উনিশশ বিশের দশকে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, দাঙ্গা ও স্বাতন্ত্র্যচেতনা বেড়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত লিবারেল দৃষ্টিভঙ্গি ও সহানুভূতির নানা নজির বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা গেছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১), দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৬৬-১৯৩৯), বিনয়কুমার সরকার (১৮৮৭-১৯৪৯) প্রমুখ এ দৃষ্টিভঙ্গির ভালো প্রতিনিধি; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উনিশশ দশের দশকের হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক নিয়ে লেখা বহু-উদ্ধৃত প্রবন্ধগুলো, এবং ভাষা-বিষয়ক প্রবন্ধগুলো এ সময়ের প্রতিনিধিত্বশীল রচনা; চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০-১৯২৫) ও সুভাষচন্দ্র বসু (১৮৯৭-১৯৪৫) চিহ্নিত হতে পারেন রাজনৈতিক প্রতিনিধি, আর অসহযোগ - খেলাফত আন্দোলনের যৌথতা ও বেঙ্গল প্যাক্টকে বলা যেতে পারে সমধর্মী রাজনৈতিক কর্মসূচির বহিঃপ্রকাশ। মুসলমান সমাজ সংখ্যাগুরুর রাজনীতিতে প্রবেশ করার আগের দশকগুলোতে বিকশিত 'বাঙালি' ও 'ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এবং অসাম্প্রদায়িক' সমন্বয়বাদের ওই যুগেই কাজী নজরুল ইসলামের মানস গঠন হয়েছিল। তাঁর নিজের জীবনে, বন্ধুত্বে ও সংশ্রবে এ আবহের যথেষ্ট নজির পাওয়া যায়।

প্রসঙ্গটা আসলে ঠিক ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা সহানুভূতিরও নয়। যুগের প্রধান হাওয়াটাই ছিল এরকম। নজরুলের অধিকাংশ জীবনীকার ও ভাষ্যকার ব্যাপারগুলোকে এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন, যেন ব্যক্তিগত চরিত্র-বৈশিষ্ট্য বা ভাবাদর্শিক 'প্রগতি'র কারণে এরকম ঘটেছে। আসলে মোটেই তা নয়। আগের প্রজন্মের বাঙালি মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের তালিকা প্রণয়ন করলেই বোঝা যাবে, সমন্বয়বাদিতাই ছিল প্রধান যুগধর্ম । শেখ আবদুর রহিম (১৮৫৯-১৯৩১), রেয়াজুদ্দীন মাশহাদী (১৮৫৯-১৯১৮), মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ (১৮৬১-১৯৩৩), আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৮৭১-১৯৫৩), মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০), ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১), মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯) প্রমুখ ওই যুগের প্রতিনিধি। এঁদের অনেকেই সমন্বয়বাদী ছিলেন — বস্তুত অধিকাংশ; আর কয়েকজন ছিলেন রীতিমতো জাতীয়তাবাদী-কংগ্রেসি। সবাই পত্র-পত্রিকা বের করেছেন। স্বজাতির কল্যাণ কামনায় কাজ করেছেন। এ স্বজাতি মুখ্যত বাঙালি মুসলমান; আর প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই অগ্রসর

বাঙালি হিন্দুর সাথে ঐক্যের মেজাজই প্রধান ছিল।

নজরুলকে বলতে পারি এ ধারার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টিশীল প্রতিনিধি, যাঁর রচনায় যুগসত্যের নান্দনিক প্রকাশ ঘটেছে।

৩.৩

প্রশ্ন হল, কোন ধরনের ব্যক্তিগত অবস্থা ও প্রস্তুতির কারণে অগ্নি-বীণাই হয়ে উঠল এক বৃহৎ জনগোষ্ঠী ও এক উত্তুঙ্গ সময়ের তীব্রতম নান্দনিক প্রকাশ।

জাতীয়তাবাদী রাজনীতির প্রচণ্ড অভিঘাতে এসময় কলকাতাকেন্দ্রিক ঔপনিবেশিক মধ্যবিত্ত শ্রেণিটি তার সীমা প্রসারিত করার উদ্যোগ নিতে বাধ্য হয়। সে সীমার মধ্যে আংশিকভাবে প্রবেশ করতে থাকে কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি জনতা, মুসলমান সম্প্রদায়, হিন্দু সম্প্রদায়ের অদ্ভুত অংশগুলো। রবীন্দ্রনাথ যে লিখেছিলেন- 'সে কবির লাগি কান পেতে আছি', তাঁর সে আকাঙ্ক্ষা আসলে নতুন রাজনৈতিক-সামাজিক বাস্তবতারই ফসল। কিন্তু শ্রেণি-অবস্থান ও সাংস্কৃতিক বলয়ের ঐতিহাসিক মেরুকরণের কারণে তাঁর নিজের পক্ষে সে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয়নি। নানা কারণে নজরুলের পক্ষে অন্তত অংশত এই কবির দায়িত্ব পালন সম্ভবপর হয়েছে।

জন্মই তাঁকে স্থাপন করেছে এক সুবিধাজনক পাটাতনে। কাজী বংশে জন্মালেও তাঁর জন্মের সময় পরিবারটিকে গাঁয়ের আর দশটি চাষি পরিবার থেকে আলাদা করে দেখার উপায় ছিল না। পরেও কর্মসূত্রে, পত্রিকা সম্পাদনায়, সাহিত্যকর্মের বিশিষ্টতায় গণমানসের সাথে তাঁর সংযোগ খুব একটা বিচ্ছিন্ন হয়নি। উপনিবেশ আমলের যেসব সাহিত্যকর্মকে আমরা বাংলা সাহিত্যের মূলধারা হিসাবে সম্মান জানিয়ে আসছি, সেগুলোর রচয়িতাদের সাথে তুলনা করে দেখলে নজরুলকে এক্ষেত্রে একেবারেই বিপরীত কোটিতে পাওয়া যাবে। নজরুলের সামগ্রিক বোধ-বিশ্বাস-কাব্যকলা- আগ্রহ-আবেগ-স্বপ্ন এই বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো ব্যাপার নয়। নজরুল যে একবার লিখেছিলেন, দারিদ্র্য তাঁকে মহান করেছে, তা কোনো আকস্মিক উচ্চারণ নয়, তাঁর শিল্পীসত্তার মর্মমূলস্পর্শী সত্য (মোহাম্মদ আজম ২০১৫)।

ব্যক্তিজীবনের আরো দুটি তথ্য অগ্নি-বীণার নান্দনিকতা বুঝতে আমাদের সাহায্য করে। একটি হল, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সাথে নজরুলের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সম্পৃক্তি। অন্যটি তাঁর সৈনিক-জীবন। বস্তুত এ দুটি পরস্পর সম্পৃক্ত; বিশেষত সৈনিকবৃত্তি নজরুলের কবিতায় গভীরভাবে ফলপ্রসূ হয়েছিল। সম্ভবত নজরুলই বাংলা সাহিত্যের একমাত্র ব্যক্তিত্ব, যাঁর পূর্ণ সামরিক জীবন যাপনের অভিজ্ঞতা ছিল। সরাসরি যুদ্ধে অংশ না নিলেও, যাকে বলে war poetry বা যুদ্ধের কবিতা, তার কিছু নমুনা নজরুলের

রচনাতেই মেলে। তবে এরকম প্রত্যক্ষ প্রভাবের চেয়ে যুদ্ধের ভাবগত দিকই অগ্নি-বীণার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে বেশি প্রাসঙ্গিক। এক্ষেত্রে সৈনিকতা আসলে একটি ছাড়পত্র। এই পরিচয় নির্দেশ করে একটি যুদ্ধ-পরিস্থিতি, যেখানে জীবন দেয়া-নেয়া বৈধ, পরিবর্তনের দাবি স্বাভাবিক, সামষ্টিকতা অবশ্যম্ভাবী, উচ্চকণ্ঠ জয়ধ্বনি আর উজ্জীবনী বাণীসকল পরিবেশের স্বাভাবিক দাবিতেই ন্যায্য।

অগ্নি-বীণা কাব্যের 'রক্তাম্বরধারিণী মা' কবিতায় কবি দেবীর 'দনুজ-দলনী' রূপের পুনরাবির্ভাব কামনা করেছেন। পৌরাণিক বরাতের ব্যত্যয় না ঘটিয়ে বর্তমানের জরুরত অনুযায়ী নির্মিত হয়েছে এই রূপ। কবিতাটি শেষ হয়েছে ধ্বংসের বুকে হাসুক মা তোর/ সৃষ্টির নব পূর্ণিমা' – এ আকাঙ্ক্ষায়, যা নজরুলের সাহিত্যকর্মের পৌনঃপুনিক উচ্চারণ। একটু খেয়াল করলেই বোঝা যায়, নজরুল পুরা কবিতায় দেবীকে সাজিয়েছেন এক সৈনিকের বেশে। সর্বাংশে প্রস্তুত ও সর্বপ্রকারে তৎপর একজন সৈনিকই কেবল আজকের জন্য দরকারি কাজ হাসিল করতে পারে। তাই তাঁর প্রস্তাব:

রক্তাম্বর পর মা এবার
জ্বলে পুড়ে যাক শ্বেত বসন।
দেখি ঐ করে সাজে মা কেমন
বাজে তরবারি ঝনন-ঝন্।

কিংবা,

মেখলা ছিঁড়িয়া চাবুক করো মা,
সে চাবুক করো নভ-তড়িৎ,
জালিমের বুক বেয়ে খুন ঝরে
লালে-লাল হোক শ্বেত হরিৎ।

পরের কবিতা 'আগমনী ও দেবীর আবাহন। এবার সম্পূর্ণ যুদ্ধ-পরিস্থিতিতে:

হৈ হৈ রব
ঐ ভৈরব
হাঁকে, লাখে লাখে
ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে
লাল গৈরিক-গায় সৈনিক ধায় তালে তালে
ওই পালে পালে
ধরা কাঁপে দাপে

এ কবিতায় পূজামণ্ডপের বাদ্য যেন অতীতকালের সুরাসুরের যুদ্ধক্ষেত্রের রণবাদ্যে পরিণত হয়েছে (রফিকুল ১৯৮২: ৩১১)। তাতে সৈন্যদলের বহুমাত্রিক রণমূর্তি পরিষ্কার পড়া যায়।

নজরুলের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের প্রতি গভীর পক্ষপাত আর সৈনিকবৃত্তির প্রায়োগিক-দার্শনিক অভিজ্ঞতার শ্রেষ্ঠ ফসল সম্ভবত অগ্নি-বীণার 'কামাল পাশা' কবিতা। কামাল পাশা নজরুলের কাছে সবসময়ের জন্য এক আদর্শ বীর। কামাল সেই নেতার সাক্ষাৎ মূর্তি, যার আগমন-প্রত্যাশায় নজরুল রচেছেন বহু আন্তরিক আকুতি। এ কবিতায়ও কামাল পাশার নেতৃত্বের সৌরভ প্রকটিত হয়েছে। কিন্তু প্রধান হয়ে উঠেছে লড়াকু বীর সৈনিকেরাই, যারা সত্য ও ন্যায়ের সমরে সর্বদাই নির্ভীক। এরা সৈনিকের ন্যায় সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল, কর্তব্য পালনে অকুতোভয়। প্রতিপক্ষের অনৈতিক অবস্থান সম্পর্কেও সুনিশ্চিত:

হিংসুটে ঐ জীবগুলো ভাই নাম ডুবালে সৈনিকের,
তাই তারা আজ নেস্ত-নাবুদ, আমরা মোটেই হইনি জের!
পরের মুলুক লুট করে খায় ডাকাত তারা ডাকাত!
তাই তাদের তরে বরাদ্দ ভাই আঘাত শুধু আঘাত!

এ সৈন্যদলের ফূর্তি তাই শুধু যুদ্ধজয় নয়, আরো বড় কিছু। বন্দি মানুষকে আজাদ করা এবং অধীন দেশ স্বাধীন করার মতো বৃহৎ-মহৎ কারণের সাথে তা যুক্ত। তাই তাদের উল্লাসের এই জোয়ার। মোটেই ব্যক্তিগত নয় এ উল্লাস, বরং অন্তর্গত আবেগের দিক থেকেই সামষ্টিক। ঠিক সৈন্যদলের মতোই সামষ্টিক। একই সাথে তারা বেদনার রক্তেও রঞ্জিত। তাদের কেউ কেউ আহত হয়েছে, কেউ নিহত। কিন্তু সৈনিক হিসাবে মৃত্যুও তাদের কাছে বীরত্ব বৈকি:

সাচ্চা ছিল সৈন্য যারা শহীদ হল মরে।
তোদের মতন পিঠ ফেরেনি প্রাণটা হাতে করে,
ওরা শহীদ হল মরে! ...
খুন দেখেছিস্ বীরের? হা দেখ টকটকে লাল কেমন গরম তাজা!
মুর্দারা সব যা যা!!

আবার এ মৃত সৈনিকদের জন্য শোক প্রকাশ করতে গিয়েই কবি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে একাকার করে নিয়েছেন সৈনিক-জীবনের সাথে। সমষ্টির মধ্যেই আবিষ্কার করেছেন ব্যক্তি সৈনিককে। সামষ্টিকতা ক্ষুণ্ণ না করেই। দু-দিক থেকে। এক. কবি বিলাপ করেছেন তাদের জন্য, যারা জীবনের শুরুতে, আমোদ-আহ্লাদের কোনো খায়েশ পুরা হওয়ার আগেই, হারিয়ে গেল জীবন থেকে। নারীসঙ্গবঞ্চনা সৈনিকজীবনের সাধারণ বাস্তবতা। ফলে বিবাহিত জীবন, স্ত্রীসঙ্গ আর সংসার তাদের পরম আকাঙ্ক্ষার ধন। সন্ধ্যাকালের আরেকটি সাধারণ বাস্তবতা হল 'অস্ত-রবির আশ্চর্য রঙের খেলা'। এ দুই সাধারণ বাস্তবতা ব্যবহার করে নজরুল সৈনিকের আশা-আকাঙ্ক্ষা, বেদনা আর কল্পনাকে

চিহ্নিত করেছেন কয়েকটি অসাধারণ চিত্রকল্পে। দুই. সৈনিকদের মৃত্যুতে ভদ্রলোকশ্রেণির প্রতিক্রিয়ার ধরনকে তীব্র ব্যঙ্গে আক্রমণ করেছেন, যেখানে সৈনিকের শ্রেণি-অবস্থান পরিষ্কারভাবে ধরা পড়েছে:

তাই যত আজ লিখে-ওয়ালা তোদের মরণ ফুর্তি-সে জোর লেখে!
এক লাইনে দশ হাজারের মৃত্যু-কথা! হাসি রকম দেখে!
মরলে কুকুর ওদের, ওরা শহীদ-গাথার বই লেখে!
খবর বেরোয় দৈনিকে,
আর একটি কথায় দুঃখ জানান, 'জোর মরেছে দশটা হাজার সৈনিকে

একেবারে শুরুর দিকের 'কামাল পাশা' কবিতা সম্পর্কে 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল: "যুদ্ধের অভিযানের জয়ডঙ্কার তালে তালে যোদ্ধাদের যে জয়োল্লাস এই 'কামাল পাশা' কবিতাটিতে পাই, তাহা এদেশের সাহিত্যে নূতন' (উদ্ধৃত, আজহার ১৯৯৭: ২৮৪)। একজন সমালোচক খেয়াল করেছেন, 'এই দীর্ঘ কবিতাটি সমিল মুক্তক স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত, কিন্তু এ কবিতার প্রকৃত ছন্দ সৈনিকদের চলার ছন্দ, এ ছন্দ এসেছে রণক্ষেত্র থেকে:

লেফ্‌ট্‌! রাইট্‌! লেফ্‌ট্‌!
লেফ্‌ট্‌! রাইট্‌! লেফ্‌ট্‌!

অথবা,

সাবাস জোয়ান! সাবাস্‌!
ক্ষীণজীবী ঐ জীবগুলোকে পায়ের তলেই দাবাস্‌ ..(রফিকুল ১৯৮২: ৩৩৭)

সৈনিকের চলার ছন্দে আছে বলিষ্ঠ ঋজুতা আর পুনরাবৃত্ত পদাঘাত, যা কবিতার ভারি হলন্ত উচ্চারণের শ্বাসাঘাতে নিষ্পন্ন হয়েছে; আর আছে গতি, যা প্রধানত অতিপর্ব ও খণ্ডপর্বের নিপুণ যোজনায় এবং পরের পক্তিকে আগের পক্তির সাথে বিরামহীনভাবে উচ্চারণের আভ্যন্তর আবেগের ফল। 'প্রলয়োল্লাস', 'বিদ্রোহী' ইত্যাদি কবিতায়ও এ বৈশিষ্ট্যগুলো পাওয়া যাবে। *অগ্নি-বীণা* এভাবে বিপ্লবী ধ্বংসযজ্ঞ আর সৈনিকতার যৌথ ইতিহাস বহন করছে।

৩.৪

জন্মসূত্রে পাওয়া আরেকটি সত্য অগ্নি-বীণায় প্রতিফলিত নান্দনিকতার অনুকূলে কাজ করেছে। তা এই যে, তিনি জন্মেছিলেন মুসলমান পরিবারে। 'মুসলমান' শব্দটি এখানে স্পষ্টতই একটি রাজনৈতিক বর্গ, আর নজরুলের সমকালের পরিপ্রেক্ষিতে শব্দটির দুটি তাৎপর্য খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। একটি হল তার শ্রেণি-তাৎপর্য, অন্যটি সাংস্কৃতিক

তাৎপর্য। মুসলিম পরিবারে জন্ম নিয়ে শ্রেণির দিক থেকে নজরুল যুক্ত হয়েছেন শোষিত- বঞ্চিত এক বিশাল জনগোষ্ঠীর বাস্তবতার সাথে, আর আবশ্যিকভাবে হুমায়ুন কবির কথিত -চৈতন্যের

সাথে। অন্যদিকে, সাংস্কৃতিক তাৎপর্যের ক্ষেত্রে – যেমনটা আহমদ ছফা (২০০২) দেখিয়েছেন – নজরুল মুসলিম সংস্কৃতির অসংখ্য উপাদান বাংলা কবিতায় যুক্ত করে খোদ 'আধুনিক' বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতির পরিসরটাকেই বিপুল ব্যাপকতা দিতে পেরেছিলেন; আর বিপরীতক্রমে বাঙালি মুসলমানকে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির কেন্দ্রীয় আবহে যুক্ত হওয়ার সাহস জুগিয়েছেন।

আমাদের বর্তমান আলোচনার জন্য প্রাসঙ্গিক সত্য হল, বাঙালি মুসলমান-সমাজে এ বৈশিষ্ট্যগুলো নজরুল থেকেই প্রথম শুরু হয়নি। নীলেশ বোস (2014) বিস্তৃত পরিসরে দেখিয়েছেন, কৃষকের প্রতি মনোযোগ, অসাম্প্রদায়িক চেতনা, মুসলমান সমাজের আধুনিকায়নের ঐকান্তিকতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য উনিশ শতকের শেষাংশ থেকে শুরু করে বিশ শতকের গোড়ার দশকগুলোতে মুসলমানদের লেখালেখি ও পত্র-পত্রিকায় প্রায় ব্যতিক্রমহীনভাবে প্রকাশিত প্রচারিত হয়েছে। মুজফ্ফর আহমদ (১৯৬০) সাক্ষ্য দিচ্ছেন, বিশ শতকের বিশের দশকে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় এবং কম্যুনিস্ট আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য উদগ্রীব মুসলমান তরুণের সংখ্যা বিস্ময়করভাবে বিপুল। কলোনিয়াল কাঠামোর মধ্যে তুলনামূলক অধিকতর নিপীড়িত শিক্ষিত মুসলমান-সমাজের একাংশের মধ্যে এ ধরনের মনোভঙ্গি খুব স্বাভাবিকভাবেই বিকশিত হয়েছিল। নজরুলের আগেই মুসলমান সাহিত্যিক সমাজে তার বিস্তর নজির পাওয়া যায়। নজরুলের আলোচনায় এ তথ্য খুব কমই উচ্চারিত হয়েছে যে, ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০- ১৯৩১) অনল-প্রবাহ (১৯০০) কাব্য লিখে ব্রিটিশ সরকারের রোষের শিকার হয়েছিলেন, এবং কারাবরণ করেছিলেন। কাব্যভাষার উৎকর্ষের দিক থেকে এ কাব্য অগ্নি-বীণার সাথে কোনো অর্থেই তুলনীয় নয়, কিন্তু উপকরণগত ও ভাবগত দিক থেকে দুই কাব্যের পারস্পরিকতা খুবই উল্লেখযোগ্য।

৩.৫

পটভূমির আওতাকে যুক্তিগ্রাহ্যভাবে বিশদ করতে পারলে অগ্নি-বীণার কবিভাষার বহিরঙ্গীয় দিকে, অর্থাৎ শব্দ-সঞ্চয়ের দিক থেকে, তুলনামূলক পরিচিত আবহের আভাস পাওয়া যাবে। এ কাব্যের শব্দভান্ডারের মূল বনিয়াদ গড়ে উঠেছে সংস্কৃত-বাংলার (অভিধাটি রবীন্দ্রনাথের) আনুকূল্যে। এ ভাষারীতির যে প্রতাপশালী সংস্কৃতি কলকাতায় উনিশ শতকে গড়ে উঠেছিল, তার প্রতি নজরুল প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। আগেই বলেছি, সময়টা ছিল সমঝোতার। সুরটা ছিল সমন্বয়বাদী। নজরুল এ আবহে গভীরভাবে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ-সূত্রে। মনে রাখা দরকার, কলকাতার হিন্দু-মধ্যবিত্ত সংস্কৃতিতে নজরুল প্রাথমিক প্রবেশাধিকার আদায় করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে; আর তাঁর অনেকগুলো গ্রন্থনাম

রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকেই নেয়া। তবে সংস্কৃত-বাংলায় তাঁর গভীর অধিকার জন্মেছিল আসলে আরো আগেই – কিশোরকালের লেটোদলের নিবিষ্ট চর্চা থেকে। হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির বিপুল নামশব্দ নজরুলের সামগ্রিক কাব্যভাষার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সেগুলোকে বিপ্লব-বিদ্রোহের অসংযমী শৃঙ্খলায় বিন্যস্ত করার অভাবনীয় সাফল্য পরবর্তীকালের; কিন্তু ওই ভাষার সাথে তাঁর নিবিড় পরিচয় অনেক আগের।

মুসলমান সমাজের সাহিত্যপ্রয়াসী তরুণ হিসাবে এ ভাষার সাথে নিবিড় পরিচয় অর্জনের ক্ষেত্রে এবং চর্চার ক্ষেত্রে তাঁর বস্তুত কোনো বাধাই ছিল না। কারণ গুরুত্বপূর্ণ মুসলমান লেখকেরা নজরুলের আগের প্রজন্ম থেকেই প্রমিত বাংলায় - এবং ক্ষেত্রবিশেষে বঙ্কিমীয় ও রাবীন্দ্রিক তৎসমবহুল বাংলায় লেখালেখি করতেন। এ ধারা শুরু করেছিলেন মীর মশাররফ হোসেন; আর এ ধরনের সমন্বয়-প্রয়াসী বাংলার আবহেই নজরুল বড় হয়েছেন। তিনি এর সাথে নতুনভাবে যোগ করেছেন প্রধানত হিন্দুস্থানি বাংলা বা দোভাষী পুথির কিছু কার্যকর স্বভাব। বস্তুত সংস্কৃত-বাংলার সাথে হিন্দুস্থানি মিশ্রিত বাংলার কাব্যিক যোগসাধনই সম্ভবত অগ্নি-বীণার কবিভাষার মূল পাটাতনটা তৈয়ার করেছিল।

তাঁর কবিতায় আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে তত্ত্বতালাশ যথেষ্ট হলেও হিন্দুস্থানির প্রভাব ও ভূমিকা সম্পর্কে আলাপ দেখা যায় না। হিন্দুস্থানি ভারতবর্ষের একসময়কার অত্যন্ত প্রভাবশালী লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা; অন্যদিকে আরবি-ফারসি একদিকে 'বিদেশি', আর অন্যদিকে মুখ্যত কেতাবি। হিন্দুস্থানি না বলে উর্দু-হিন্দির কথা বললেও ভারতীয় ভাষার কথাই বলা হয়। কিন্তু আমাদের প্রায় যাবতীয় ডিসকোর্সে আলাপটা হিন্দুস্থানি বা হিন্দি-উর্দুর বরাতে না হয়ে আরবি-ফারসির ভিত্তিতে যে হয়, তার পেছনে উনিশ শতকের জটিল সাংস্কৃ তিক রাজনীতি মুখ্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ভারতীয় মুসলমানদের 'বিদেশি' বলার ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক সুবিধা'র সাথে এই পুরো প্রকল্প অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। এ বিষয়ের অধিকতর বিস্তার বর্তমান প্রসঙ্গের জন্য জরুরি নয়। বিষয়টা স্পষ্ট করার স্বার্থে শুধু একটি উদাহরণ দেব। পুরনো পুথিসাহিত্যের ভাষায় আরবি-ফারসি ইত্যাদি হরেক রকমের ভাষার মিশ্রণ ঘটেছে বলে ব্যাপকভাবে মনে করা হয়। কিন্তু সাধারণভাবে এসব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে হিন্দুস্থানির নাম নেয়া হয় না। অথচ বাস্তবতা হল, সেকালে হিন্দুস্থানি এমনকি ইউরোপীয় বণিকদের ব্যবহৃত ভাষাগুলোর মধ্যেও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এর ব্যবহারগত বিস্তার বোঝা যাবে শুধু এ উদাহরণ থেকেই যে, ইউরোপীয়রা ভারতীয় ভাষাগুলোর মধ্যে হিন্দুস্থানি নিয়েই সবচেয়ে বেশি ব্যাকরণ প্রণয়ন করেছিল; আর এগুলো বেশ জনপ্রিয়ও হয়েছিল। এই বাস্তবতা মাথায় রেখে কথিত পুথির ভাষাকে হিন্দুস্থানি এবং বাংলার ব্যবহারিক প্রায়োগিক মিশ্রণ হিসাবে দেখলে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে বিস্তর সুবিধা পাওয়ার কথা। তা হয়নি। নজরুলের ক্ষেত্রেও প্রায় একই রকম ঘটনা ঘটেছে। তাঁর হিন্দি গান, বাঙালির প্রায় অচেনা হিন্দুস্থানি লজ, হিন্দি-হিন্দুস্থানি শব্দরূপের ব্যবহার ইত্যাদি প্রত্যক্ষ উপাদানের উপস্থিতি সত্ত্বেও 'আরবি-ফারসি' বর্গের বাইরে আলোচনাটা যায়নি।

বস্তুত অগ্নি-*বীণার* বাকরীতির বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ স্বভাব এসেছে হিন্দুস্থানি থেকে, আর নজরুল এ উত্তরাধিকার সন্দেহাতীতভাবে পেয়েছেন তাঁর সময় পর্যন্ত অত্যন্ত সচল পুথিসাহিত্যের

ধারা থেকে। ‘কামাল পাশা’, ‘আনোয়ার’, ‘রণ-ভেরী’, “শাত-ইল- আরব”, ‘কোরবানি’, ‘মোহররম’ - অগ্নি-বীণার অন্তত এ ছয়টি কবিতা শব্দ সঞ্চয়, সুর- বিন্যাস এবং উচ্চারণভঙ্গির দিক থেকে দোভাষী পুথির প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকার বহন করছে।

৪

নান্দনিক বিশিষ্টতার সামগ্রিক পর্যবেক্ষণের জন্য সমাজতাত্ত্বিক পটভূমির সাথে কাব্যভাষার ধারাবাহিক বিকাশের ইতিবৃত্তও যোগ করা দরকার। যেমন, অগ্নি-বীণার কবিতাগুলোর যে সম্পূর্ণতা ও সম্পন্নতা, তার পশ্চাৎপট উন্মোচনের জন্য যেতে হবে রবীন্দ্রকাব্যের ভুবনে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের কবিতার যুক্তিগ্রাহ্য ও ধারাবাহিক বিন্যাসের বিপরীতে অগ্নি- বীণায় পাই মুখ্যত বিশেষ ভাব ও মুহূর্তের পৌনঃপুনিক বিস্তার। খেয়া-পারের তরণী’ কিংবা ‘কামাল পাশা’র মতো অসামান্য উদাহরণ থাকলেও অগ্নি-বীণার কবিতাগুলোকে রাবীন্দ্রিক রূপকল্পের শৃঙ্খলা মোতাবেক পাঠ করা যায় না। এ কাব্যের ধ্বনি-ব্যঞ্জনা ও সুরের সমারোহের অন্তত আংশিক ইতিহাস পাওয়া যাবে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যধারায়, যদিও দুইয়ের পার্থক্যও খুব উল্লেখযোগ্য।

তবে, কোনো সন্দেহ নাই, বৃহৎ জনসমাজ আর তুরীয় বর্তমানকে অতি-নতুন নান্দনিকতার বশীভূত করতে পারাই অগ্নি-বীণার প্রধান কৃতিত্ব। আধুনিক বাংলা কবিতায় এ বিস্তার আগে আর দেখা যায়নি। এ কারণেই এ কাব্যের বিচার-বিশ্লেষণে সমাজতাত্ত্বিক পটভূমি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর কার্যকর হয়ে উঠেছে। কোনো কোনো সময় আবির্ভূত হয় নতুন ভাব আর তৎপরতার সমারোহ নিয়ে। কোনো কোনো মুহূর্ত ধারাবাহিকতার তুলনায় ছেদকেই বড় করে তোলে। ওই সময় বা মুহূর্তের ‘বর্তমান’কে আবিষ্কার করা খুব বড় শৈল্পিক প্রতিভার কাজ। অগ্নি-বীণার নজরুল কাজটি করতে পেরেছেন অভাবনীয় নতুনত্ব আর সাফল্যের সাথে। কাজেই এ কাব্যের আলোচনায়-যে বর্তমানময়তাকে প্রাধান্য দেয়া হয়, তা ঠিকই আছে। বর্তমানের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও ভাবলোকের রসায়ন ছাড়া শিল্পের ওই কার্যকরতা কখনোই তৈরি হয় না, যা এ কাব্যের ক্ষেত্রে ঘটেছে। ঘটমানতার তীব্রতাকে স্পর্শ করেই কবিতাগুলো মূর্ত হয়েছে। কাব্যিক বাস্তবতা এবং যাপনের বাস্তবতা গভীর তাৎপর্যে তার সঙ্গী হয়েছে। আর তাতেই জন্ম নিয়েছে কাব্যটির ক্লাসিক সৌন্দর্য – আবদুল মান্নান সৈয়দের (১৯৮৭) ভাষায় কালজ হয়েই হয়েছে কালোত্তর ।

সহায়কপঞ্জি

আজহারউদ্দীন খান, ১৯৯৭। *বাংলা সাহিত্যে নজরুল*। সুপ্রীম পাবলিশার্স, কলকাতা।

আবদুল মান্নান সৈয়দ, ১৯৮৭। *নজরুল ইসলাম: কালজ কালোত্তর*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা ।

আহমদ ছফা, ২০০২। *নির্বাচিত প্রবন্ধ*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

ওয়াল্টার বেনজামিন, ২০২০। 'যান্ত্রিক পুনরুৎপাদনের যুগে শিল্পকলা', মোহাম্মদ আজম অনূদিত। *বিষয় সিনেমা: তিনটি অনূদিত প্রবন্ধ* গ্রন্থভুক্ত। চৈতন্য, সিলেট।

গৌতম ভদ্র, ২০১১। *ন্যাড়া বটতলায় যায় ক'বার?*। ছাতিম বুক্স, কলকাতা।

দেবেশ রায়, ১৯৯১। *উপন্যাস নিয়ে*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

মুজফ্‌ফর আহমদ, ১৯৬০। *আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি*। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা।

মুহম্মদ নূরুল হুদা, ১৩৯৫। 'বিবর্তিত বাঙালী ও নজরুল ইসলাম'। *রবীন্দ্র প্রকৃতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*। মুক্তধারা, ঢাকা।

মোহাম্মদ আজম, ২০১৩। ''আধুনিক' বাংলা কাব্যধারায় নজরুলের স্থান বিচার'। *সাহিত্য পত্রিকা,* সংখ্যা ২-৩, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

মোহাম্মদ আজম, ২০১৫। ''অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস': 'দারিদ্র্য' ও নজরুলের সাহিত্যতত্ত্ব''। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা,* ৯১-৯৩ সংখ্যা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

মোহাম্মদ আজম, ২০২৩। *মিখাইল বাখতিন: যাপিত জীবন ভাষা ও উপন্যাস*। প্রকৃতি, ঢাকা।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (সম্পাদিত), ১৯৯৯। *নজরুল সমীক্ষণ*। নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ১৩৭৯। 'নজরুল ইসলাম ও হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক'। *নজরুল সমীক্ষণ,* মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত। আনন্দ প্রকাশন, ঢাকা।

রফিকুল ইসলাম, ১৯৮২। *কাজী নজরুল ইসলাম: জীবন ও কবিতা*। মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০০০। *বাংলা কবিতার কালান্তর,* প্রথম দে'জ সংস্করণ। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০১১। 'বটতলার 'দোভাষী' সাহিত্য – সেকাল ও একাল'। *অনুষ্টুপ,* সম্পাদক: অনিল আচার্য, বটতলা বিশেষ সংখ্যা, বর্ষ ৪৫, ৪র্থ সংখ্যা। কলকাতা।

সৈয়দ আলী আহসান, ১৯৯১। *রবীন্দ্রনাথ: কাব্য বিচারের ভূমিকা*। আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা।

সৈয়দ আলী আহসান, ১৯৯৩। *আধুনিক বাংলা কবিতা: শব্দের অনুষঙ্গে*। শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা।

হাসান হাফিজুর রহমান, ১৯৯৩। *আধুনিক কবি ও কবিতা,* ২য় সংস্করণ, প্রথম পুনর্মুদ্রণ। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

হুমায়ুন কবির, ২০০২: *বাংলার কাব্য,* বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা।

Bose, Neilesh 2014. Recasting *the* Region: Language, Culture, and Islam *in* Colonial *Bengal*. Oxford Uninersity Press, India.

Chakrabarty, Dipesh 2002. 'Memories of Displacement: The Poetry and Prejudice of Dwelling. in *Habitations of Modernity: Essays in the Wake of Subaltern Studies.* The University of Chicago Press, Chicago.

Kaviraj, Sudipta 2003. The Two Histories of Literary Culture in Bengal'. in *Literary Cultures in History: Reconstructions from South Asia.* Edited by Sheldon Pollock. University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London.